ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

আসাদ চৌধুরীঃ ব্যক্তি ও কবি

*মোঃ ফয়সাল বারী

সার-সংক্ষেপঃ আসাদ চৌধুরী ষাটের দশকের অন্যতম কবি। তাঁর কবিতায় সমকালীন জীবন ও যুগের সুখ-দুঃখের প্রতিফলন যেমন ঘটেছে, তেমনি শাশ্বত জীবনবোধ সৃষ্টিতে তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য। তাঁর শিল্পী মানসে আজন্ম লালিত ইতিহাস, ঐতিহ্য, বাঙালির বীরত্বগাথা ও জীবনবোধের সুনিপুণ সৌন্দর্যের প্রকাশ ফুটে উঠেছে। সমাজের শোষকশ্রেণি ও লুটেরাদের চিত্র তাঁর শিল্পমানসকে যেমন ব্যথিত করেছে তেমনি জীবনবোধের গভীর টানকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কবিতার শাশ্বত রূপ। প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী এবং গণমানুষের অধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, জীবন ও জগতের প্রতি গাঢ় ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর কাব্যে সবকিছুকে অকৃপণভাবে ধারণ করতে পেরেছেন। তাঁর শিল্পদর্শনের রূপটি বহুমাত্রিক। ফলে তাঁর শিল্পীমানস হয়ে উঠেছে শুদ্ধাচারী এক জীবনবাদী লোকজ কবির অকুণ্ঠ বর্ণনার ব্যঞ্জনাময় মূর্ত প্রতীক। আলোচ্য প্রবন্ধে কবির মানসগঠন ও বিকাশের ধারা বিবৃত হয়েছে।

প্রাক-কথন

জনপ্রিয় কবি ও প্রখ্যাত উপস্থাপক *তবক দেওয়া পান* এর রাতুল অধর কবি আসাদ চৌধুরী। তাঁর জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের দক্ষিণে 'ধান নদী খাল, এই তিনে বরিশাল'-এর শ্যামল স্নিগ্ধ পাললিক ভূমি জোয়ারভাটার গ্রাম উলানিয়াতে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মাদ আরিফ চৌধুরী, মাতা সৈয়দা মাহমুদা খাতুন। স্ত্রীর নাম সাহানা বেগম। তাঁর দুই ছেলে আরিফ চৌধুরী ও জারিফ চৌধুরী এবং এক মেয়ে নুসরাত জাহান চৌধুরী শাওলা। কবি আসাদ চৌধুরী ষাটের দশকের কবিতায় নতুন মাত্রার রূপকার। এই রূপ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তাঁর ভাষা ও প্রকরণে। যেখানে তাঁর কবিতাকে লোকজ ঐতিহ্য, প্রেম-সৌন্দর্য ও মরমি চেতনার মানসশিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারল্য এবং স্পষ্টভাষী এই কবি লোকজ ঐতিহ্যের বুননে তাঁর কবিতাকে সর্বজনীন পাঠ হিসেবে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। আসাদ চৌধুরী এক চেতনার নাম, মাটির শেকড়ের নাম, বাঙালির লালিত লোকজ ঐতিহ্যের নাম। আপাদমস্তক বাঙালিয়ানা এক কবি। সদা হাস্যোজ্জ্বল কর্মব্যস্ত এই কবি লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্য, সংস্কৃতি সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর দরাজ কণ্ঠের আবৃত্তি শ্রোতা, দর্শকদের অভিভূত করে। দেশে-বিদেশে তিনি নান্দনিক উপস্থাপনা শৈলীর জন্য জনপ্রিয়।

শৈশব

তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় উলানিয়া গ্রামে। গ্রামীণ ছায়াঘেরা সবুজ দিগন্ত ছুঁয়েই আসাদ চৌধুরীর বেড়ে ওঠা। শৈশব কৈশোরের স্মৃতিময় বর্ণিল দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে তাঁর গ্রামের অবারিত মাঠ ঘাট দেখে আর মাঝির কণ্ঠের ভাটিয়ালি গান শুনে। ফলে বাংলার নদী নালা, খাল বিল, গ্রামীণ ঐতিহ্য আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক শৈশব থেকে। বরিশালের ঐতিহ্যবাহী ব্রজমোহন কলেজের সাথেও

* উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দুমকি, পটুয়াখালী

সম্পৃক্ত হয়েছেন শিক্ষাসূত্রে। শৈশব থেকেই লোকগীতি ও ভাটিয়ালি গান শুনে শুনে তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বাল্যকাল থেতেই সাধক বাউল ও সন্ন্যাসীদের উদার চেতনা এবং মরমিবাদ তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

আসাদ চৌধুরী উলানিয়ার হাই স্কুল থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহ্যবাহী বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকে যাওয়ার পর কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আসাদ চৌধুরীর চাকরিজীবন শুরু। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে ঢাকায় স্থিত হয়ে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভয়েস অব জার্মানির বাংলাদেশ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর বাংলা একাডেমিতে দীর্ঘকাল চাকরির পর তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এ পদে থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কবি আসাদ চৌধুরীর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৬১ সালে *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় নিহত 'প্যাট্রিস লুমুম্বার' প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 'ইতিহাসের আর এক নায়ক' নামে কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। যা রণেশ দাশগুপ্ত *দৈনিক সংবাদ* এর সাহিত্য পৃষ্ঠায় নয়, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছেপেছিলেন। উল্লেখ্য, ভুলক্রমে এই কবিতাটি কবির কোনো কাব্যগ্রন্থেই ছাপা হয়নি। কবি আসাদ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে লিখে যাচ্ছেন। তিনি প্রবন্ধকার, অনুবাদক, শিশুসাহিত্যিক, ছড়াকার এ জাতীয় নানা বিশেষণে বিশেষায়িত হলেও তাঁর প্রধানতম পরিচয় তিনি কবি। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠা যতটা কঠিন এরচেয়েও বেশি কঠিন কবি হয়ে ওঠা। কেননা মানুষকে মানুষ হতে হলে যে গুণে গুণান্বিত হতে হয় তার সবটুকু আত্মস্থ করেই একজন কবি, কবি হয়ে ওঠেন, জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখেন। এই যে জীবনবোধের উপলব্ধি কবি তা প্রত্যক্ষ করেন অন্তর্দৃষ্টির দ্রষ্টা হিসেবে। কবি আসাদ চৌধুরীর কবি মানসের তেমনি প্রতিফলন তাঁর কবিতায়। তিনি ব্যক্তিত্ববোধকে সর্বজনীনবোধে রূপান্তরিত করার সুনিপুণ শব্দশিল্পী। ষাটের দশকে কবি হিসেবে তাঁর গোড়াপত্তন হলেও তিনি সমকালীন বাঙালির প্রিয় কবি। তাঁর নিজস্ব কবিভাষা নির্মাণে যেমন স্বকীয়তা রয়েছে, তেমনি সমকালীন জীবন ও যুগের সুখ-দুঃখের নির্যাস আত্মস্থ করে শাশ্বত জীবনবোধ সৃষ্টির অনস্বীকার্য সাফল্যও রয়েছে। আজন্ম লালিত ইতিহাস, লোকজ ঐতিহ্য ও জীবনবোধের সুনিপুণ সৌন্দর্য প্রকাশ তাঁর কবিতার মৌল উপাদান। এই কবির এ পর্যন্ত প্রকাশিত ১৭টি কাব্যগ্রন্থ, ৩টি কবিতা সংকলন, ১টি কবিতাসমগ্র, ১৫টি শিশুসাহিত্য, ৩টি জীবনীসাহিত্য, ১টি ইতিহাসগ্রন্থ, ১টি প্রবন্ধ-গবেষণা, ৩টি অনুবাদ, ২টি সম্পাদনাগ্রন্থ ও ২টি ছড়া গ্রন্থের সার্থক প্রয়াস লক্ষণীয়।

কবিতার আঙ্গিক রূপ

আসাদ চৌধুরীর কবিতা পড়ে সচেতন পাঠকদের মনে জীবনের যে রঙটি বিকশিত হয় এবং উপলব্ধির প্রতিবিম্বে যে রূপ ধরা দেয় তার যথাযথ বিচার এখন সময়ের দাবি। তাই সমালোচকের দৃষ্টিতে আসাদ চৌধুরী ও তাঁর কবিতার বিচার এ রকম–

> কবিতার কাছ থেকে যিনি জীবনের পাঠ নেন, তিনি নিজেই আবার যখন ব্যাপৃত হন কবিতার সাধনায়, তখন তাঁর কবিতায় জীবনের কোন রঙটি ফুটে ওঠে সর্বাগ্রে? অথবা দৃষ্টির আয়তনে ধরা দেয় কোন রূপ? কিংবা বোধ ও উপলব্ধির আঙিনায় সঞ্চারিত হয় কোন নতুন মাত্রা? যারা আসাদ চৌধুরীর কবিতার সচেতন পাঠক অথবা সমালোচক তাঁরা নানাভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করেছেন এবং লক্ষ করেছেন– কোনো জটিল জীবন বিন্যাসের উপাসক তিনি নন। মগ্ন চৈতন্যের গভীর অন্তঃপুরে সমাহিত হয়ে স্বসৃষ্ট নৈঃসঙ্গ্যের বাতাবরণে জীবনকে প্রহেলিকাময় করে তুলতেও তিনি অনাগ্রহী। আবার অনতিক্রম্য বিষাদের তমসায় মোড়ানো জীবনেরও স্তাবক তিনি নন। কিংবা নন নিছক নগরে ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে যাপিত জীবনের রূপকার। স্নেহ, প্রেম, সারল্য অবসাদ আনন্দ বেদনার অবিরল আলোকসম্পাতে যে জীবন স্পন্দিত এবং অনাদি অতীত থেকে বর্তমানের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক অনপনেয় ও অলীন পথরেখা ধরে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত সেই চিরায়ত আটপৌরে জীবনেরই স্নিগ্ধ রূপকার তিনি।[১]

আসাদ চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তবক দেওয়া পান* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। ষাটের দশক থেকে শুরু করে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিয়মিত পত্রপত্রিকায় কবিতা লিখে আসছিলেন। ফলে একজন কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই পাঠক মহলে যেভাবে আলোচিত হয়ে ওঠেন তার অনেক আগেই তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাই বলা যায় ১৯৭৫ এর পূর্বেই আসাদ চৌধুরী কবি হিসেবে পাঠকনন্দিত। তাঁর *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর তাৎক্ষণিকভাবে একটি পত্রিকার সাহিত্য সংবাদ -এ লেখা হয়–

> দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হলো ষাট দশকের কবি আসাদ চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি লিখে আসছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতা, লিটল ম্যাগাজিন, এমনকি মফস্বল থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রে কবি আসাদ চৌধুরীর জ্বলজ্বলে উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও বাজারে তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ না থাকায় কাব্য সমালোচকগণ বিভিন্ন সময়ে অসুবিধায় পড়েছেন আসাদ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। কবি আসাদ চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ আরো আগে প্রকাশিত হতে পারত। সম্ভবত উদ্যোগের অভাব এবং প্রকাশনা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যমূলক অবস্থার কারণে আসাদ চৌধুরীর বই প্রকাশ বিলম্বিত হল।[২]

তবক দেওয়া পান (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থে স্থান পাওয়া ৫৩টি কবিতার অধিকাংশ কবিতাই দেশজতা ও লোকজ ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আসাদ চৌধুরী ভুলে যাননি মাটির গন্ধ, শেকড়ের টান, লোকজ ঐতিহ্যের গীতলতা আর কবিতায় আধুনিক বুনন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আমার বাবা'। সংসারের চিরন্তন মায়ের আচঁলের বাইরে বাবার আদরের অনবদ্য সৃষ্টি এই কবিতা, যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে কালের বিপরীতে বাবার ভালোবাসার নৈকট্য হিসেবে।

আমার বাবা বাসতো ভালো আমাকে
আমার ময়লা জামাকে
শোনো বলি চুপি চুপি
আমার উলের রঙিন টুপি
দিত মাথায় ফাঁক পেলেই
হাসতো তখন দাঁত মেলেই।[৩]

বাবার এই ভালোবাসা শুধু কবিকে ঘিরেই প্রকাশ পায়নি এ ভালবাসার রূপ আরো বেশি বিচিত্র ও সুগভীর ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়েছে। যেন সাদা আর কালো মানুষের ভেদাভেদ ভুলে মহত্তর মর্যাদা পেয়েছে। মুদির ছেলে, কাজীপাড়ার শান্তি ধোপা, রিকশাচালক, কানু বদ্যি এই শ্রেণি বৈষম্যহীন মানুষকে ভালোবাসার যে গল্প বাবাকে দিয়ে কবি কবিতার শব্দে গড়ে তুলেছেন, তা আসাদ চৌধুরী যে মানুষের কবি সেই কবিমানসের পরিচয়ই তুলে ধরবার প্রয়াস। *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থের 'স্বীকারোক্তি', 'আয়না', 'বৃক্ষের স্বভাব চরিত্র'- কবিতাগুলোর মধ্যে প্রাচীন লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব পদ এবং লালন শাহ এর কবিতার ভাবাবেগ ও উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। লোকজতা এই একটি শব্দে আসাদ চৌধুরীর কবিতাকে বেশি চিহ্নিত করা যায়। এই লোকজ উপাদান এবং লৌকিক শব্দের সহজাত ও নিপুণ ব্যবহার তাঁর কবিতাকে সমকালীন কবিদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এর মূল কারণ নাগরিক জীবনকে তিনি উপেক্ষা না করে বরং বাংলা কাব্যের আদি ও লোকজ ধারার উপকরণ আত্মস্থ করেই তাঁর কবিতাকে নতুনভাবে সাজিয়েছেন। এ এক অনবদ্য সৃষ্টিকৌশল। যেমন 'ধান নিয়ে ধানাই পানাই' কবিতায়–

লবণ লবণ ডাক পাড়ি
লবণ গেলো কার বাড়ি?
লঙ্কা-লঙ্কা ডাক পাড়ি
লঙ্কা গেলো দেশ ছাড়ি!
আয়রে মুর্দা ঘরে আয়
দুধ-মাখা ভাত কাকে খায়॥[৪]

এই কবিতাটিতে যেমন দুর্ভিক্ষের দুঃসহ স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় তেমনি কবিতাটির সাথে লোকসাহিত্যের ছড়ার চিরায়ত মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং অর্থগত ও বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্যও বিদ্যমান। যেমন–

ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে ,
খাজনা দেবো কিসে?[৫]

এই ছড়াটির অন্তর্নিহিত গূঢ় তাৎপর্য আছে। এখানে ছড়ার স্বপ্নকথার চেয়ে অতীত তিক্ত স্মৃতিই যেন শব্দের আকরে প্রকাশ পেয়েছে। আসাদ চৌধুরীর কবিতায়ও ছড়ার বহুবিধ প্রয়োগের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তিনি সমাজের, দেশের, জাতির অতি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সহজসরল ভাষায় ছড়ায় ব্যক্ত করেছেন। বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়া। ছড়ায় অর্থ থাকে গভীর গোপনে লুক্কায়িত, সহজে ধরা দেয় না।

কিন্তু ছড়ার ছন্দ, জাদুমন্ত্রের মতো মুগ্ধ করে। আসাদ চৌধুরীর কবিতার সাফল্যের একটি মৌল উপাদান তাঁর কবিতায় লোকজ ধারার প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ার বহুল ব্যবহার। যেখানে তাঁর কবিতাকে চিনতে সাধারণ পাঠকদেরও ভুল হয় না। যেমন– 'আসবে যতো সাহার্য কমবে ততো আহার্য।'[৬] এভাবে তাঁর লেখায় প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়াগুলোতে আধুনিক বুননের মধ্যেও লোকজধারা নতুনভাবে রূপ পেয়েছে। *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থের 'তখন সত্যি মানুষ ছিলাম' একটি অসাধারণ কবিতা হিসেবে কালের স্বাক্ষরে ভাস্বর হয়ে আছে।

নদীর জলে আগুন ছিলো
আগুন ছিলো বৃষ্টিতে
আগুন ছিলো বীরঙ্গনার
উদাস করা দৃষ্টিতে।[৭]

ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের যে বীরত্বগাথা এবং মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অধিকার আদায়ের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও অন্যায় নিপীড়ন রুখে দাঁড়ানোর সময়কে কবি স্বমহিমায় ব্যক্ত করেছেন। কবি ভেবে পান না, যে ঐতিহ্যের চেতনায় গড়া এই বাঙালির ইতিহাস তা কেবল সেই অতীত সময়ে ছিল- নাকি এর অবসান হয়েছে! 'সত্য ফেরারী' কবিতায় কবি 'সত্য'কে খুঁজে ফিরছেন কিন্তু সত্য নামক সোনার হরিণের দেখা মেলে না। সমাজে যে অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটেছে তা কবি অনুভব করতে পারছেন এবং সেই সত্যই কবি তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়-

কোথায় পালালো সত্য
দুধের বোতলে, ভাতের হাঁড়িতে!
নেই তো।[৮]

'চোর' কবিতায় সমাজের শোষক শ্রেণির এবং লুটেরাদের চিত্র বিধৃত করেছেন অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে এই সমাজ সচেতন কবি। রোগের ঔষধ, ধারের জমিন, ধর্মবিবেক, মুখের ভাষা সব কিছু যেন চুরি করে এই চোর এবং মস্তচোর যখন পালকি চড়ে পালায় তখন বুঝতে বাকি থাকে না এই গভীর সত্যের ইঙ্গিত। তবু কবি এই চোরের নামটি বলতে চান না। যেমন– 'নামটি চোরের বলতে গেলে হবেন দাদা জব্দ।'[৯] জব্দ না করার শালীনতাবোধে আসাদ চৌধুরীর কবিতা শিল্পিত সত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিত্ত নাই বেসাত নাই* (১৯৭৬)। এই কাব্যগ্রন্থে আসাদ চৌধুরীর সমাজ, স্বদেশ ও ব্যক্তি সচেতনতার বোধটি আরো বেশি তীব্র ও চমৎকারিত্বে প্রকাশ পেয়েছে।। 'স্বীকারোক্তি' কবিতায় নিজেকে লড়াইয়ের নিয়ম না জানা এক নগণ্য মানুষ মনে হয়েছে তাঁর। ফলে বনজফুলের মতন দুচোখ দিয়ে রাগ-অনুরাগের ব্রীড়া ঝরে পড়েছে। সবকিছু মূল্যহীন মনে হয়েছে রুটি-রুজির কাছে। তাই 'ভাগ্য' কবিতায় ভাগ্যটাকে যেন মন্দ বলেই মনে হয় তাঁর।

প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড় (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থে বেশ কিছু কবিতায় কবির দুঃখবোধ প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির বর্ণিল উপমার মাধ্যমে। তাঁর *জলের মধ্যে লেখাজোখা* (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় কবির এই দুঃখবোধের ছায়াঘন দৃষ্টির রেখাপাত দৃশ্যমান এবং

সে দুঃখবোধের দৃষ্টিতে গৃহকোণের কষ্টকেও কবি উপেক্ষা করেননি। 'আমার দুঃখ' কবিতায় কবির দুঃখের দ্রাঘিমা যেন সীমাহীন বেদনায় অনিবার্য হয়েছে গৃহ কোণের কষ্ট–

তুমি দুঃখ পেলে অকারণে বুক পেতে দাঁড়াতাম,
এ-রকম হতো।
এখন ওষুধ খুঁজি, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করি;
কিছুটা বিরক্ত হই তোমাদের অসতর্ক আচরণ দেখে
সাহানা, আমার দুঃখ, তুমি দুঃখ চিনলে না বলে।[১০]

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আসাদ চৌধুরী জীবনবাদী কবি এবং যুগ ও সময় সচেতন কবি। সময়ের ঘটনাপুঞ্জ এবং আলোড়ন তাঁর অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে। ফলে ভালো মন্দ, আশা নৈরাশ্য, সাফল্য ব্যর্থতার সবকিছু জীবনের ক্ষয়িষ্ণু বলে অবজ্ঞা না করে আপন করে নিয়েছেন। আর কষ্টের হলাহল পান করেও জীবনকে ভালোবেসেছেন। তাই শুধু গৃহকোণের কষ্টই নয়, মানুষের ভীরুতা, অসদাচারণ ও আদর্শচ্যুতি তাঁকে বারংবার কষ্ট দিয়েছে তবুও মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। তিনি মানুষের কবি হয়েই আবার মানুষের কাছে ফিরে এসেছেন। সমাজে বিদ্যমান অসাম্য ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বঞ্চনা তাই তাঁকে ব্যথিত করে, ক্ষুব্ধ করে 'লোকটা' কবিতায় সে চিত্রই ফুটে উঠেছে–

ওদের হাতে ঘড়ি তো নেই
সময় তো নেই
সূর্য হলেন ঘড়ি
কয়েক ছটাক চালের জন্য
ডালের জন্য
সব্জি-আনাজ, লবণ-ত্যানা, ওষুধ-বিষুদ,
জোগাড় করতে, করতে, করতে,
করতে, করতে [১১]

যাদের হাতে ঘড়ি নেই, ঘড়ি কেনার সামর্থ্য নেই কেবল সূর্য দেখে সময় চিনে নেওয়ার সেই অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের কয়েক ছটাক চাল. ডাল জোগাড় করতে জীবনের শেষ সময় এসে হাজির হয় তবু এর অবসান হয় না। এই অসমাপ্ত কষ্টের পৌনঃপুনিকতা যেন বেড়েই চলছে। কবি এই কবিতার শেষে কোনো কমা, দাঁড়ি ব্যবহার না করে যেন চলমান রেখেছেন। এ ধারা শেষ হবার নয়। শেষ হয় না, হয় না।

যে পারে পারুক (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় কবির লোকজ সহজাত প্রবণতা অনিবার্যভাবে ধরা দিয়েছে। ধরা দিয়েছে মানব সভ্যতার নামে তৃতীয় বিশ্বের মানবেতর জীবনের চিত্র। ভিক্ষুকের শীর্ণ হাত, ক্ষুধা, অভাব এ সব কিছুকে কবি বিদায় জানাতে চান। এই কাব্যগ্রন্থের 'শহীদদের প্রতি', 'এরই নাম স্বাধীনতা' ও 'রিপোর্ট ১৯৭১' কবিতায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকাশ ঘটেছে বিশেষ মর্যাদায় এবং কবি ভিন্ন মাত্রায় অনুভব করতে চান চেতনাকে।

কষ্টার্জিত একাত্তরের পরে যে স্বাধীন স্বদেশ, সে স্বদেশ যেন মানুষের স্বাধীনতার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

এরই নাম স্বাধীনতা কবিতায় কবির সেই ভাব ব্যক্ত হয়েছে–

মরার কাফন ভাতের লবণ
কেড়ে নিল স্বাধীনতা?
ওঠে আহাজারি প্রতি ঘরে-ঘরে
এরই নাম স্বাধীনতা[১২]

এই কাব্যগ্রন্থের 'বারবারা বিডলার-কে' কবিতাটি যেন মুক্তিযুদ্ধের দলিল। ইতিহাস খ্যাত বারবারা বিডলার ভিয়েতনামের যুদ্ধ নিরসনের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে আকুল আবেদন নিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কবি সেই বারবারা বিডলারকে উদ্দেশ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নৃশংস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

টু-উইমেন ছবিটা দেখেছে বারবারা?
গির্জায় ধর্ষিতা সোফিয়া লোরেনকে দেখে নিশ্চয়ই কেঁদেছিলে
আমি কাঁদিনি বুকটা শুধু খাঁ খাঁ করেছিল-
সোফিয়া লোরেনকে পাঠিয়ে দিও বাংলাদেশ,
ত্রিশ হাজার রমণীর নির্মম অভিজ্ঞতা শুনে
তিনি শিউরে উঠবেন।[১৩]

যে পারে পারুক কাব্যগ্রন্থের অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় পাই 'ফাগুন এলেই' কবিতায়–

ফাগুন এলেই পাখি ডাকে
থেকে থেকেই ডাকে
তাকে তোমরা কোকিল বলবে? বলো।
আমি যে তার নাম রেখেছি আশা,
নাম দিয়েছি ভাষা,
কতো নামেই 'তাকে' ডাকি
মেটে না পিপাসা।[১৪]

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির মাতৃভাষাকে দিয়েছিল কথা বলার অধিকার। প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বাংলা ভাষার গৌরব ও স্বাধিকার। মাতৃভাষার চেতনার রঙে রঙিন বাংলা ভাষাকে কত নামে যে কবি ডাকতে চান তবু তাঁর পিপাসা মেটে না। তাঁর শিল্পিত চেতনায় কোকিলের কণ্ঠেও যেন বাংলা ভাষার সুমধুর ধ্বনি শুনতে পান। ফাগুন মাস হয়ে উঠেছে ভাষার বর্ণিল রূপের দার্শনিকতার রূপকল্প। এমনি করে দেশপ্রেম, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক শোষণ, পীড়ন ও সুখ-দুঃখের জীবনবোধ তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। তাই সমালোচকদের দৃষ্টিতে আসাদ চৌধুরীর কবিতার রূপ ধরা পড়ে এভাবে–

> তাই ৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমূহকে বরাবরই তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। শহীদ মিনার তাঁর মনে স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে তিনি শরিক হয়েছিলেন তাঁর সবটুকু সামর্থ্য নিয়ে। দেশের বৃহত্তর এবং প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোর সঙ্গেও ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ। তাই এ সব আন্দোলন এবং যুদ্ধে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। সেই শ্রদ্ধা এবং বিনম্র ভালোবাসার অভিব্যক্তি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতায়।[১৫]

মধ্য মাঠ থেকে (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা কোন না কোন খ্যাতিমান ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত লেখা। যার প্রতিটি কবিতা আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'চরম পত্র' কবি সৈয়দ শামসুল হককে উদ্দেশ্য করে লেখা। যেখানে কবি আসাদ চৌধুরী বোঝাতে চেয়েছেন, জীবন, জগৎ, বৈচিত্র্য সবকিছু পরাজিত কিন্তু কেবল কবি সত্য এবং তিনি পরাহত নন। সমস্ত আয়োজন যেন কবিকে ঘিরে–

মানুষের সভ্যতা পরাজিত
মানুষের অসভ্যতা পরাজিত
...
আপনাকেই ধন্যবাদ
আপনার জন্যই তো এতো আয়োজন।[১৬]

মেঘের জুলুম, পাখির জুলুম (১৯৮৫) কাব্যের 'বানের পানি' কবিতায় বানভাসি মানুষের স্বপ্ন ও খেতের ফসল কেড়ে নেওয়ার কষ্ট কবিকে ব্যথিত করে। তাই কবি গোপনে বানের পানির সাথে কথা বলতে চান। এ যেন কবির ব্যথিত চিত্তের ব্যাকুলতা–

বানের পানি
তোমার সাথে আমার কিছু
কথা ছিলো
গোপন কথা।[১৭]

কবিদেরও কথা থাকে! প্রকৃতির সাথে, মানুষের সাথে, জয়-পরাজয় আর গভীর বোধের সাথে। এই কথার সূত্রকে অবলম্বন করেই একজন কবি তাঁর কাব্যের উঠোন তৈরি করেন। কবির এই শিল্পিত প্রকাশই কবিতার লীলাভূমি। সেই লীলাভূমিতে আসাদ চৌধুরীর শৈল্পিক মহিমা বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে কবিই কবির উপমা।

দুঃখীরা গল্প করে (১৯৮৭) কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাতেই কবির মানুষের প্রতি সমাজের প্রতি দুঃখবোধ প্রকাশ পেয়েছে এবং সেই দুঃখবোধের সকল কারণ কবির পক্ষে মেটানো সম্ভব নয় বলেই কবির মনোবেদনা ব্যক্ত পেয়েছে 'যা পারে না' কবিতায়–

হয়তো পারি অনেক কিছুই
যা পারি না (ধরুন যেমন)
লোভীর চোখের দীপ্তিটুকু
একটি ফুঁতে নিভিয়ে দিতে,
ভীরুর চলায় গতি দিতে
ভিখারীদের হ্যাংলা হাতে
মর্যাদার মহিমা দিতে...[১৮]

আসাদ চৌধুরীর অনেক কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ স্থান পেয়েছে নানা মর্যাদায় এবং প্রেরণার হাতিয়ার হিসেবে। *নদীও বিবস্ত্র হয়* (১৯৯২) কাব্যের 'অজ্ঞাত শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কথা' কবিতায় কবির উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছে আরো অনেক নাম না জানা গ্রাম গঞ্জের শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্মরণ কথা। কবি যেন আরেক ইতিহাস রচনা করতে প্রয়াসী। কবিতার শেষ

লাইনে সেই অজ্ঞাত শহিদদের উদ্দেশে কবির উচ্চারণ– "যারা যায় ক্ষুধার্ত কবরে, কোনো দিন তারা ফিরে আসে?"[১৯] এ রকম ফিরে না আসা শহিদদেরকে কবি ভুলে যেতে চাননি।

কবি আসাদ চৌধুরী বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ নিয়ে বেড়ে ওঠা কবি। ফলে লোকজতা, দেশীয় ঐতিহ্য, বাউল এসব তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। কবি যেখানেই থাকুন না কেনো এ যেন তাঁর চির জীবনের পাথেয়। *বৃষ্টির সংসারে আমি কেউ নই* (১৯৯৮) কাব্যগ্রন্থে 'এ-মাটি আমাকে ছাড়ে না' কবিতাটিতে কবির সেই মনো বিহ্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যতো দূরে যাই এ-মাটি আমাকে ছাড়ে না,
...
যতো দূরে যাই এ-মাটি ছায়ার মতো,
অন্ধ প্রেমিকের মতো
আমার পেছনে পেছনে আছে।[২০]

কিছু ফুল আমি নিভিয়ে দিয়েছি (২০০৩) কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় জীবনের অপরিমেয় শক্তিকে জাগিয়ে তোলার বাসনা এবং এ পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করে তাকে বাসযোগ্য করবার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। এই কাব্যের 'ক্লান্ত' শব্দটি 'তোমার জন্য নয়, যুবক' কবিতায় কবির কণ্ঠে সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই 'ছাড়পত্র' কবিতার প্রতিধ্বনির যোজনা–

ক্লান্ত শব্দটি তোমাকে মানায় না,
গা ঝাড়া দিয়ে ওঠো হে
এখনও প্রাণপণে সরানোর মতো
অনেক জঞ্জাল জমে অছে পৃথিবীতে,
এখনও স্বপ্নের মতোই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে
বাসযোগ্য সূচ্যগ্র মেদিনী।[২১]

কবি মাত্রই সুন্দরের পূজারি, একথা আসাদ চৌধুরীর ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়। এই সুন্দরের প্রকাশ তাঁর কবিতাকে করেছে নানা অলংকারে ভূষিত। অনির্বাণ সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা কবির কাব্য শরীরকে করেছে সুশোভন। এ যেন তাঁর রূপকামী সৌন্দর্যের প্রকাশ। তাই আসাদ চৌধুরীর কবিতার দেহে চিত্রকল্প, উপমা, অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষার সযত্ন ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন–

সমাসোক্তি

সিকি- চাঁদ আহ্লাদে ভেঙ্গে পড়ে
পুকুরের জলে
রমণীরা কেউ নেই, রূপসীরা
ঢেউয়ের বদলে
মিশে আছে মাছরাঙা পাখিটির
বর্ণিল দেহে।[২২]

রূপক

শস্যের শরীরে ইদানীং মানুষের
কারুকাজ চোখে পড়ে।

...
সোনালী রোদের সাথে
সবুজের গভীর সঙ্গমে, থেলিসের
জল-ছাঁট সিঁড়ি বেয়ে কোথায় এলাম?[২৩]

অনুপ্রাস

শ্যামল তোমার গ্রীবাটুকু সিমেন্ট দিয়ে ঘেরা
সাহসী সব হাঁসের সাঁতার, সাদা বিহঙ্গেরা
ঠিকই ওড়ে, আমি কেবল উড়তে গিয়ে পড়ি
নদীর কাছে গিয়ে তবু নদীর জন্যে মরি।[২৪]

অতিশয়োক্তি

আগুন ছিলো গানের সুরে
আগুন ছিলো কাব্যে।
মরার চোখে আগুন ছিলো
একথা কে ভাববে।[২৫]

উৎপ্রেক্ষা

নদীও বিবস্ত্র হয়, খুলে রাখে বেবাক বসন,
সূর্যাস্তের পর এই নদী- বহমান জলরাশি-
এমন রহস্যময়ী, যেন তাকে কখনো দেখিনি।[২৬]

প্রাচীন চর্যাপদ থেকে অধুনা কবিতায় ছন্দের মিল থাকুক আর নাই থাকুক তবু কাব্যপ্রেমী কবিতায় ছন্দ খুঁজে থাকেন। তাই কবিতার শরীরে দোলা লাগাবার যে কারুকাজটি ছন্দের দোলায় দোলায়িত, আসাদ চৌধুরী সে বিচারেও সফল। তাঁর কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের বহুল প্রয়াস লক্ষণীয়। যেমন–

অক্ষরবৃত্ত :

কতোটুকু দুঃখ পেলে / পাতা ঝরে যায়	৮+৬
সূর্যের মেজাজী আলো / তাকে কি শেখায়[২৭]	৮+৬

এখানে প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতেই (৮+৬) মাত্রার দুটি পর্ব রয়েছে।

স্বরবৃত্ত :

হাত বাড়ালেই / বন্ধু আসেন	৪+৪
হাত বাড়ালেই / ফুল	৪+১
এ- সব যখন / ঘটত তখন	৪+৪
দারুন / হুলুস্থুল[২৮]	৪+১

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে স্বরবৃত্ত ছন্দের পংক্তিতে ৪ মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে। অপূর্ণ পর্বের ১ মাত্রার।

গদ্যছন্দ

এই বুঝি শেষ দুঃখ,
এরপর অন্য কোনো দুঃখ-টুঃখ নেই,

দুঃখ তার যবনিকা ফেলে চলে গ্যাছে শেষে-
আমিও বাহিরে এসে সিগ্রেট ধরাবো
সমস্ত দুঃখের বাইরে ভাসাবো সাঁতার।[২৯]

এভাবেই কবি আসাদ চৌধুরী ছন্দ ও অলংকারে নানা বৈচিত্র্যে, নানা আয়তনিক কবিতার সৃষ্টিতে মগ্ন থেকেছেন। ফলে ক্রমান্বয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই তাঁর স্বভাব সুলভ কবি ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের নব নব উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায়, এই কবির নিজস্ব কবি ভাষা ও ব্যক্তিবোধ সর্বজনীনবোধে রূপান্তরিত হয়েছে কাব্যিক মুগ্ধতায়।

জীবন দর্শন

সাধারণ অর্থে কবির কবিতাই তাঁর জীবনের দর্শন। আসাদ চৌধুরী জীবনকে উপলব্ধি করেন কবিতার মাঝে। তাই তাঁর কবিতার শিল্পিত রূপের আড়ালে যে জীবন ভাষ্যের প্রকাশ তাকেই জীবন দর্শনের অভিধায় অভিহিত করা যেতে পারে। কবির উচ্চারণ– 'আমার জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কবিতা আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে, আনন্দিত হতে শিখিয়েছে। আনন্দ বেদনায় পরিপূর্ণ জীবনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।'[৩০] তাই আসাদ চৌধুরীর কবিতায় যে দর্শন পরিস্ফুটিত হয়, তা একদিকে যেমন বাংলার লোকজ ঐতিহ্য ও দেশজতার প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ, অপরদিকে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও মমত্ববোধের অশেষ দায়ভার। কবি নাগরিক আভিজাত্যের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করেও লোকজ উপকরণকে উপেক্ষা না করে বরং সমকালীন মেজাজকে কবিতার প্রতিপাদ্য করেছেন। তাঁর কবিতায় জীবনবোধের বহুমাত্রিক নৈর্ব্যক্তিকতা স্থান পেয়েছে। স্থান পেয়েছে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দর্শন। যে কারণে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও মানুষের সুখ-দুঃখ, শোষণ, পীড়নের নিখাদ চিত্রের বর্ণনার বহিঃপ্রকাশ তাঁর কবিতা। তিনি হৃদয় খুঁড়ে যে গোপন বেদনাবোধের উৎসারণ ঘটিয়েছেন তা যেন বিষাদের দীর্ঘ ছায়া। তবুও এই কবি হতাশ নন। অনুভব করেন না কবিতার বিপরীতে নিজেকে দাঁড় করাতে। ফলে আশাহীন স্বপ্নের অলীক বিশ্বাসে তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন মানুষের ওপর। মানুষের সুপ্ত সাহসকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে। ফলে জীবন দর্শনের যে রূপটি তাঁর কবিতায় স্পন্দিত হয়েছে- তা শুদ্ধাচারী কবির বিমূর্ত জ্যোৎস্নার উপচে পড়া আলো। এই কবি রোমান্টিক হয়েও ভাববাদী নন। তাই তাঁর প্রেয়সী অর্ধমানবী বা কোনো দেবী নন।

আসবে বলে আশার সকল পথে
ফেলে এলাম শোকের চোখের জল
কাঁটার পরে বক্ষ পেতে দিলাম
পরশ পাবে তোমার চরণতল।[৩১]

সমাপ্তি-কথা

আসাদ চৌধুরী ষাটের দশকের কবি হয়েও তিনি সমকালীন। নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হয়েও তিনি লোকজ ও দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী। তাঁর স্বতন্ত্র কবিভাষা

নির্মাণে যেমন পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষার বুননের সাথে দেশজতা লক্ষণীয় তেমনি আধুনিক মনস্কতা তাঁর লেখাকে করেছে সর্বজনীন। সমাজসচেতন কবিপুরুষ আসাদ চৌধুরী তাঁর কবিতার দেহে লোকজতার পাশাপাশি বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি ব্যঙ্গ রসাত্মক ভঙ্গিতে তিনি মানবসমাজের মূলভিত্তি খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। দুঃখবোধ তাঁর কবিতায় এক আলংকারিক শৈল্পিক চেতনার মতো। প্রাচীন থেকে আধুনিক, নিজের গৃহকোণ থেকে কোনো কিছুই কবির দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। ছন্দ, অলংকার, তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যবহার তাঁর কবি মর্যাদাকে দিয়েছে কালের প্রতিষ্ঠা।

তথ্যসূচি :

---

১ সরদার আবদুস সাত্তার, *লেখক পরিচিতি*, কবিতাসমগ্র, আসাদ চৌধুরী (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা, ২০০৮), পৃ. ৯-১০

২ সরদার আবদুস সাত্তার, *লেখক পরিচিতি*, কবিতাসমগ্র, আসাদ চৌধুরী, পৃ. ১২ ও ১৩

৩ আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, আমার বাবা, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ৩৩

৪ আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, ধান নিয়ে ধানাই পানাই, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৫৬

৫ ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা*, (ঢাকা, বইপত্র, বাংলাবাজার-২০১২), পৃ. ২৮১

৬ আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, শ্লোক, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৫৩

৭ আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, তখন সত্যি মানুষ ছিলাম, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৫৪

৮ আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, সত্য ফেরারী, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৫৬

৯ আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, চোর ২, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৫৮

১০ আসাদ চৌধুরী, *জলের মধ্যে লেখাজোখা*, আমার দুঃখ, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ১৫২

১১ আসাদ চৌধুরী, *জলের মধ্যে লেখাজোখা*, লোকটা, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৬২

১২ আসাদ চৌধুরী, *যে পারে পারুক*, এরই নাম স্বাধীনতা, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা ২০০৮), পৃ. ১৫২

১৩ আসাদ চৌধুরী, *যে পারে পারুক*, বারবারা বিডলার-কে, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২১৫

১৪ আসাদ চৌধুরী, *যে পারে পারুক*, ফাগুন এলেই, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২০৭

১৫ সরদার আবদুস সাত্তার, *লেখক পরিচিতি*, কবিতাসমগ্র, আসাদ চৌধুরী, পৃ. ১৭

১৬ আসাদ চৌধুরী, *মধ্যমাঠ থেকে*, চরম পত্র, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ২২৬

১৭ আসাদ চৌধুরী, *মেঘের জুলুম, পাখির জুলুম*, বানের পানি, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ২৬৬

১৮ আসাদ চৌধুরী, *দুঃখীরা গল্প করে*, যা পারে না, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ২৮৭

১৯ আসাদ চৌধুরী, *নদীও বিবস্ত্র হয়*, অজ্ঞাত শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কথা, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ৩২৪

২০ আসাদ চৌধুরী, *বৃষ্টির সংসারে আমি কেউ নই*, এ-মাটি আমাকে ছাড়ে না, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ৩৬৯

[২১] আসাদ চৌধুরী, *কিছু ফুল আমি নিভিয়ে দিয়েছি*, ক্লান্ত শব্দটি তোমার জন্য নয় যুবক, কবিতাসমগ্র, (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ৪১০

[২২] আসাদ চৌধুরী, *কিছু ফুল আমি নিভিয়ে দিয়েছি*, এলে বেলে:, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৪০৫

[২৩] আসাদ চৌধুরী, *প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়*, শস্যের পথরেখা ধরে, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮) পৃ. ১১৩ ও ১১৪

[২৪] আসাদ চৌধুর, *দুঃখীরা গল্প করে*, ভুল নদী, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২৯৮

[২৫] আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, তখন সত্যি মানুষ ছিলাম, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৫৪

[২৬] আসাদ চৌধুরী, *নদীও বিবস্ত্র হয়*, নদীও বিবস্ত্র হয়, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৩৩৪

[২৭] আসাদ চৌধুরী, *প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়*, শেষ হওয়া নয়, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৩২

[২৮] আসাদ চৌধুরী, *জলের মধ্যে লেখাজোখা*, রূপান্তর, কবিতাসমগ্র, পৃ. ১৬৫

[২৯] আসাদ চৌধুরী, *বিত্ত নাই বেসাত নাই*, আমার দুঃখ-টুঃখ, কবিতাসমগ্র (ঢাকা, বাংলাবাজার, অনন্যা-২০০৮), পৃ. ৯৩

[৩০] সরদার আবদুস সাত্তার, *লেখক পরিচিতি*, কবিতাসমগ্র, আসাদ চৌধুরী, পৃ. ৯

[৩১] আসাদ চৌধুরী, *তবক দেওয়া পান*, প্রেম: ১, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৪৫